Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা পুথির পাটাচিত্রে রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যকৃপা প্রাপ্তি

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	প্রণবকুমার সাহা
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.10
Pages	১৮৯-১৯৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা পুথির পাটাচিত্রে রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যকৃপা প্রাপ্তি

Check for updates

প্রণবকুমার সাহা*

শিল্প ও সাহিত্যের সমন্বয় ঘটেছে বাংলার পুথিগুলির প্রচ্ছদপটে।[১] সাহিত্য যেমন নান্দনিক, শিল্প তেমনি নান্দনিক। সকল শিল্পীই সাহিত্যিক নন, সকল সাহিত্যিকই শিল্পী নন। বাংলার মাটিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঙালির নান্দনিক চেতনায় শিল্প ও সাহিত্যের রাখিবন্ধন ঘটেছিল।

চিত্র-১

বাংলার পুথি বাঙালির মনন জগতের সংকেত, পরিচয় বহন করে বেড়ায়। মুদ্রণের ব্যবস্থা ইংরেজরা নিয়ে আসে। তার আগে বাঙালির ঘরে ছাপা বই ছিল না। অথচ অনেক কীর্তিমান পণ্ডিতমহাশয় তাঁদের ভাবনা চিন্তা ও জ্ঞানের পরিচয় হাতে লিখে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন। এরূপ একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে আলোচনা করা হল।

চিত্র-২

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, ভারত।

আলোচ্য চিত্র তিনটির বিষয়বস্তু একই কিন্তু চিত্রকর ভিন্ন। তিনটি চিত্রে প্রধান প্রধান পাত্র-মিত্র একই। বাকি পার্শ্ববর্গের কিছু রদবদল ঘটেছে। চিত্রে অভিমুখ থেকে বসা-দাঁড়ানোর ভঙ্গি, বেশভূষার পরিবর্তন কম বেশি লক্ষ করা যায়। কেননা, চিত্র তিনটি যে ভিন্ন চিত্রকরের — সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁদের রং ব্যবহার ও শিল্প শৈলীর পার্থক্য আছে। চিত্র তিনটি বাংলার পুথি প্রচ্ছদের কাষ্ঠফলক চিত্র। প্রথম চিত্রটি আশুতোষ মিউজিয়ামে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) সংরক্ষিত আছে। সংগ্রাহক বীরভূম জেলা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু বীরভূমের কোন অঞ্চলের পরিবার থেকে সংগ্রহ করেছেন তার উল্লেখ মিউজিয়ামের নথিপত্রে নাই। সংগ্রাহক চিত্র ও রচনাশৈলী দেখে উল্লেখ করেছেন, চিত্রের বিষয়বস্তু — রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে চৈতন্যদেবের মিলন। বাকি চিত্র দুটি ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় (কলকাতা) মিউজিয়ামের। সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত। এখানে শুধু উল্লেখ করা আছে, চিত্র দুটি বাংলা পুথি প্রচ্ছদের কাষ্ঠফলক চিত্র। বাকি কোনো কিছুর উল্লেখ নাই। তিনটি চিত্র কোন পুথির তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। বলা যেতে পারে, কাষ্ঠফলকগুলি পুথি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। চিত্রগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর।

চিত্র-৩

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় চৈতন্য-জীবনী থেকে বোঝা যায়, প্রেমাবেশে মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে বাহ্যজ্ঞান অবস্থায় রায় রামানন্দ অথবা সার্বভৌমের(?) কোলে শুয়ে আছেন। আর প্রভুর চরণতলে বৈষ্ণব বেশধারী প্রতাপরুদ্র নতজানু অবস্থায় বসে আছেন। এরূপ এক নাটকীয় দৃশ্যে প্রধান প্রধান পাত্র-মিত্রের পাশে নানা পার্শ্ববর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কেননা চিত্র তিনটি অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

১
ভণিতা

উপরিউক্ত চিত্র তিনটি পুথির অংশবিশেষ। কোনো এক অজ্ঞাত চিত্রকরের অংশ। পুথি রচনা বা অনুলিখনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি; পুথির মধ্যে তাঁদের কম বেশি পরিচয় দেওয়া থাকে। যেমন, স্বয়ং কবি থেকে শুরু করে লিপিকর, পৃষ্ঠপোষক, মালিক, গায়েন

প্রভৃতির নাম উল্লেখ থাকে। এসব ব্যক্তির বাইরে আরেক শ্রেণির মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কিন্তু তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুথির পৃষ্ঠায় ও পাটা বা প্রচ্ছদে চিত্র কারা অঙ্কন করতেন? কোথাও কোথাও পুথির পৃষ্ঠায় চিত্র সন্নিবিষ্ট চিত্রকরের নাম না পাওয়া গেলে তার আভাস আছে।[২] কিন্তু কারা পাটা চিত্র অঙ্কন করতেন? পুথির মধ্যে কোথাও পাটা চিত্রকরের পরিচয় পাওয়া যায় নি। সুতরাং, পুথির পাটা অঙ্কনের ব্যাপারটা ঘটে পুথি লেখার পর। পুথির পাটা অলংকরণকারীকে 'চিত্রকর' বা 'সূত্রধর'[৩] যে সম্প্রদায় বলি না কেন, তাঁরাও এক কবিমনের শিল্পী। যাঁদের মধ্যে রয়েছে নান্দনিক কৃতী, অভিনব সৃষ্টিকুশলতা, নতুন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে পুথি পাঠ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকরের বিষয়। চিত্রকর কোন বিষয়টাকে বেছে নিচ্ছেন? কেনই বা তাকে বেশি গুরুত্ব দিলেন? এ সমস্ত কথার উত্তর হল, তাঁরা শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষক বা পুথির মালিক না হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা চিত্রকররা লিপিকর নয় ('যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং')। তাঁরা এক ধরনের নান্দনিক সৃষ্টিকুশল শিল্পী। তাঁদের তুলির টানে স্থান-পরিবেশের পরিবর্তন ঘটবেই তাঁদের মর্জি ও রুচির উপর। সময়, নাটকীয়তা, ভঙ্গি সব কিছুর ঊর্ধ্বে আরেক নতুন চিন্তার জগৎ।

ইতঃপূর্বে, বিমানবিহারী মজুমদার 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় 'প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যকৃপা প্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার' – নামক এক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা)। তাঁর মতে, "বিভিন্ন চরিতকারদের বর্ণনা হইতে ১৫১০, ১৫১২ এবং ১৫১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্রকে শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়াছিলেন পাওয়া গেলেও উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব নহে।" (বিমান, ১৩৭৭ : ৬৩) প্রবন্ধের শেষে তিনি সমস্ত যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, ১৫১৭-১৮ খ্রিষ্টাব্দ প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যকৃপা প্রাপ্তির কাল। তিনি তাঁর যুক্তিকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন পুথির সাহায্য নিয়েছেন। এখানে প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যকৃপা প্রাপ্তির কাল নির্ণয় করা হলেও স্থান ও পরিবেশের কথা বলা হয়নি। এই স্থান ও পরিবেশ অনুভব করা আমার কাছে একটি নতুন পাঠ বলে মনে হয়।

২
মূল কাহিনি

Journal of the Asiatic Society, Bengal, 1893 No. 2; ওড়িয়া লেখ বিষয়ে মনোমোহন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, চৈতন্যদেব পুরীতে ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দেন ফাল্গুন মাসে পৌঁছাবার এগারো বছর পূর্বে প্রতাপরুদ্র গীতগোবিন্দের পরম অনুরাগী ছিলেন। এমনকি, স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত উৎকলখণ্ডে (৬/৬) আছে, উৎকল দেশের অধিবাসীরা সকলেই বৈষ্ণব। প্রতাপরুদ্র মুখ্যত জগন্নাথের সেবক ছিলেন। তাঁর কুলগুরু জীবদেব 'ভক্তি ভাগবত' নামক কাব্যের শেষে (শ্লোক ৩০) নিজেকে কৃষ্ণভক্ত বলেছেন। এই প্রমাণ দৃঢ়তর হয় রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক হতে। নাটকটি চৈতন্যদেবের মিলনের পূর্বে লেখা হয়েছিল। কেননা এতে চৈতন্যদেবের কোনো উল্লেখ নাই এবং প্রত্যেক গীতের শেষে গজপতি প্রতাপরুদ্রের নাম কোন না কোনোভাবে উল্লেখ আছে। চৈতন্যদেবের পূর্বে সকল উৎকলবাসী গীতগোবিন্দের পরম অনুরাগী ছিলেন এবং

অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় এ সময়ে অদ্বৈতবাদের প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। বলভদ্র রাজগুরু *অদ্বৈত-চিন্তামণি* ও *শারীরিক-সার* নামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুত্র গোদাবর মিশ্র *অদ্বৈত দর্পণ* লেখেন। তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের শীর্ষস্থানীয় বাসুদেব সার্বভৌম লক্ষ্মীধরের *অদ্বৈত-মকরন্দের* এক সুবিস্তৃত টীকা তৈরি করেন। এই টীকায় প্রতাপরুদ্রের নাম উল্লেখ করে লেখা আছে যে, তিনি কৃষ্ণদেব রায়কে পরাজিত করেন। এই রচনাটি অবশ্য ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দের চৈত্র মাসের পূর্বের রচনা। যখন বাসুদেব অদ্বৈতবাদে চরম বিশ্বাসী ছিলেন।

এ সকল তথ্যের (দ্র. বিমান, ১৩৭৭ : ৫৫-৫৬) ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, বাসুদেব সার্বভৌম ও রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও বিভূতি দেখে অদ্বৈতবাদের জীবব্রহ্মের ঐক্য ছেড়ে উপাস্য-উপাসকের দ্বৈত সম্বন্ধ মেনে নেন। তাঁর পরমভক্ত হন। এবং পরবর্তী সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উপরের চিত্রগুলি রাজা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের দৃশ্য। চিত্রগুলি কোন ভঙ্গিতে অঙ্কন করা হয়েছে তা বোঝার জন্য সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলি একবার স্মরণ করা যেতে পারে।

জয়ানন্দের মতে, চৈতন্যদেব জগন্নাথের আদেশে নিত্যানন্দ ও অন্য ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কটকে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। (দ্র. বিমান, ১৩৭৭ : ৫৭) চৈতন্যদেব পথ দিয়ে যেতে ছিলেন তা দেখে রাজা যে হাতিতে চড়ে নগর ভ্রমণ করছিলেন তা হঠাৎ মাথা নামায়। রাজা এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে লাফ দিয়ে নেমে চৈতন্যদেবকে বললেন যে তিনি রাজমদে মত্ত; তাঁকে যদি প্রভু ত্রাণ করেন তবে তাঁর প্রভূত মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। এবং চৈতন্যদেব আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু এরপর জয়ানন্দ লেখেননি যে, তখনই প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়েছিলেন কিনা। অন্যত্র জয়ানন্দ লিখেছেন যে, দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে চৈতন্যদেব পুরীতে আসার পর সার্বভৌমের মুখে সকল কথা শুনে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে দর্শন করবার জন্য পুরীতে এলেন। তারপর জয়ানন্দ লিখেছেন যে, রাজা ও রাণী চৈতন্যদেবের অষ্টভুজরূপ দর্শন করেন।

মুরারি গুপ্তের (৪/১৬) মতে, চৈতন্যদেব গৌড়দেশ ও বৃন্দাবন ভ্রমণের পরে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেন (দ্র. বিমান, ১৩৭৭ : ৫৮)। তিনি সার্বভৌম ও রামানন্দের কাছে জানতে চান যে চৈতন্যদেবের দর্শন কীরূপে পাবেন। তাঁরা জানান যে, সাধারণভাবে দর্শন পাওয়া অসম্ভব। তবে যখন চৈতন্য-নিত্যানন্দ কীর্তনের আনন্দে মগ্ন থাকবেন তখন যেন রাজা দর্শন করেন। রাজা উপদেশ মতো কীর্তনকালে চৈতন্যদেবের প্রণাম ও স্তব করেন। তিনি ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করেন এবং ভাগবতের রাসলীলা হতে কিছু শ্লোক পাঠ করেন।

নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাস তাঁর *চৈতন্যমঙ্গলে* মুরারিকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, চৈতন্যদেব বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ-শান্তিপুরাদি দর্শন শেষে পুরীতে ফিরে আসার পর একদিন রাজা জগন্নাথ দর্শনের সময় বারংবার জগন্নাথ মূর্তির পরিবর্তে চৈতন্যদেবের মূর্তি দেখতে পান। তিনি ব্যাকুল হয়ে চৈতন্যদেবের দর্শন পাবার

জন্য তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হন। (দ্র. বিমান, ১৩৭৭ : ৫৮-৫৯) রাজা বারংবার দ্বারপাল গোবিন্দকে অনুরোধ করেন চৈতন্যদেবের সঙ্গে কোনো প্রকারে দর্শন করিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে রাজা পুরীতেই থাকেন। দুই চারদিন পরে একদিন কাশীমিত্রের বাড়িতে যখন ভক্তগণ চৈতন্যদেবের নিকট বসে আছেন, তখন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী প্রভুকে রাজার দর্শন-ব্যগ্রতার কথা সসংকোচে জানালেন। চৈতন্যদেব তাঁর উত্তরে জানান যে, 'সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে রাজ দরশন'। তখন পরমানন্দ পুরী বললেন যে, একথা শুনলে রাজা প্রাণত্যাগ করবেন, তিনি প্রভুর চরণদর্শনের প্রত্যাশায় আট-দশদিন অনাহারে আছেন। সকলে মিলে চৈতন্যদেবকে এইভাবে অনুরোধ করলে প্রভু বলেন, 'আচ্ছা, রাজাকে আনো, আমি প্রসন্ন হলাম'। তখন প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে প্রণাম করলেন : 'ষড়ভুজ শরীর প্রভু করে পরকাশ'। তারপর রাজা গদ্‌গদ চিত্তে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে হরি হরি বলে নাচিলেন।

বৃন্দাবন দাস এমন কিছু লেখেন নি যা হতে অনুমান করা যায় যে, চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রকে দেখা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। (দ্র. বিমান, ১৩৭৭ : ৬০) অবশ্য তাঁর ভক্তদের ইচ্ছা থাকলেও 'তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে'। তাই রাজা সরাসরি একদিন ফুল বাগানে, যেখানে পারিষদগণ সঙ্গে চৈতন্যদেব বসে ছিলেন, সেখানে প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও স্তুতি পাঠ করলেন। প্রভুও রাজার কাকুবাদ শুনে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

কবি কর্ণপুর ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে পরিণত বয়সে *চৈতন্য চন্দ্রোদয়* নাটক লেখেন। অষ্টম অঙ্কে দেখি, সার্বভৌম অত্যন্ত সসংকোচে চৈতন্যদেবকে জানিয়ে দেন যে ভূপাল শ্রীচরণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত। (দ্র. বিমান, ১৩৭৭ : ৬১-৬২) প্রভু যদি অনুমতি দেন তবে তাঁকে নিয়ে আসবেন। এ কথা শুনে চৈতন্যদেব কানে আঙুল দিয়ে বলেন, বিষয়ী ব্যক্তি ও নারীকে দর্শন বিষ ভক্ষণের চেয়েও গর্হিত। একথা শুনে সার্বভৌম বললেন যে একথা সত্য বটে, তবে রাজা জগন্নাথের সেবক। এরপর চৈতন্যদেব বলেন যে, যদি এরূপ প্রস্তাব পুনরায় বলা হয়, তাহলে তাঁকে আর এখানে দেখা যাবে না অর্থাৎ মহাপ্রভু অন্যত্র চলে যাবেন। এদিকে রাজা ঠিক করেছেন যে চৈতন্যদেবের যদি দর্শন না পাওয়া যায় তবে তিনিও তাঁর জীবন ধারণ করবেন না। রাজার দুঃখ দেখে এবং জীবন পরিত্যাগের সংকল্প শুনে সার্বভৌম এক উপায় ঠিক করলেন। চৈতন্যদেব যখন রথোৎসবে নৃত্য বিনোদনজাত পরিশ্রম দূর করার জন্য নির্জন উপবনে বসবেন, তখন যেন প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করে সকলের অলক্ষ্যে সহসা তাঁর নিকট উপস্থিত হন। রাজা তাতে রাজি হলেন। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সাষ্টাঙ্গে চৈতন্যদেবের পদযুগল আলিঙ্গন করলেন। মহাপ্রভু তখনও আনন্দে চোখ বুজে ছিলেন।

'প্রতাপরুদ্র অনুগ্রহ' নামক এই অষ্টম অঙ্ককে অনুসরণ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে*র মধ্য লীলায় একাদশ পরিচ্ছেদ লেখেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী নতুন কয়েকটি কথাও সংযোজন করেছেন। (দ্র. বিমান, ১৩৭৭ : ৬২-৬৩) যেমন, সার্বভৌম রাজাকে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে মহাপ্রভুকে প্রণাম করতে বলেছেন। দ্বাদশ

পরিচ্ছেদে যখন প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের প্রেমে বশীভূত হয়ে প্রভুকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, রামানন্দও চৈতন্যদেবকে অনেক বোঝালেন কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্র পুত্রকে আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হলেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আছে যে রথযাত্রার সময় রাজা নিজে পথে ঝাড়ু দিচ্ছেন দেখে মহাপ্রভু আনন্দিত হলেন। রাজাও হরিচন্দনের কাঁধে হাত দিয়ে চৈতন্যদেবের নৃত্য দেখে পরম আনন্দ লাভ করলেন। নাচতে নাচতে প্রভু পড়ে যাচ্ছেন দেখে প্রতাপরুদ্র তাঁকে ধরলেন। তাঁর স্পর্শে চৈতন্যের মনে ধিক্কার জন্মাল। তা দেখে রাজা ভীত হলেন। কিন্তু সার্বভৌম তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, পথ ঝাড়ু দেওয়া রূপ হাড়ির কাজ করতে দেখে চৈতন্যদেব রাজার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। তবে যে বিরক্তি প্রকাশ করছেন তা লোককে বিষয়ী-সংসর্গ ত্যাগ করার শিক্ষা দেবার জন্য। সার্বভৌম রাজাকে আরও বললেন যে, তিনি সময় মতো তাঁকে যখন জানাবেন তখন যেন তিনি প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৌলিক রচনা। *কবি কর্ণপুর* বা অন্য কোনো গ্রন্থে এসব কথা নাই। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আছে যে, রাজা সার্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ ছেড়ে বৈষ্ণববেশে প্রভুর পদযুগল আলিঙ্গন করে রাসলীলার (ভা ১০/৩১/৯) 'তর কথামৃতং' শ্লোকটি বারবার বলতে লাগলেন। মহাপ্রভুও এই শ্লোকে কথিত 'ভূরিদা' হয়ে চৈতন্য বা সম্বিত লাভ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি, আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া উপকার করিলে?' রাজা বললেন, তিনি তাঁর দাসের দাস।

৩
মূল্যায়ন

জয়ানন্দ ও মুরারিগুপ্ত ব্যতীত উপরিউক্ত সকল জীবনীকারের বিবরণের সঙ্গে পুথির পাটা চিত্রের কম বেশি সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। *কবি কর্ণপুরের* বর্ণনা ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে হুবহু মিল পাওয়া যায়। কবিরাজ গোস্বামী *কবি কর্ণপুরের* অনুসরণেই লেখা। তাই কৃষ্ণদাসের সঙ্গে মিল থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অন্য জীবনীকারদের সঙ্গে কিছু কিছু মিল আছে। অথচ চিত্রগুলি সবই বাংলা পুথির পাটাচিত্র। কোন পুথির পাটা চিত্র জানা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে, চিত্রকরের কাছে সমস্ত জীবনীকারের ঘটনাই জানা ছিল। যার ভিত্তিতে তিনি এক সম্পূর্ণ নাটকীয় ভঙ্গিতে চিত্রটি উপস্থাপন করেছেন। চিত্রকররা যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। হয়তো চিত্রকর পাঠ্যকাব্য বা শ্রুতিকাব্যের আশ্রয়ে এক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছেন। সুতরাং, তাঁরা যে কবিমননের শিল্পী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, পুথির পাটা চিত্রগুলি চিত্রকরের আদর্শ সম্পাদনার ফসল।

পুথির উপরিভাগের প্রচ্ছদ বা পাটার উপর অলংকরণে একদিকে যেমন নান্দনিকতা বজায় রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি চিত্রগুলি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাও অনুমান করা যায়। মূলত, পূর্ব-ভারতীয় পুথির অলংকরণের ইতিহাস পালযুগ থেকে। (দ্র. সরসীকুমার, ১৯৭৮) কিন্তু বাংলা পুথির অলংকরণ চৈতন্য-পরবর্তী সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। ছাপাখানা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার পূর্বে আঠারো ও উনিশতকে পুথি অলংকরণের রেওয়াজ দারুণভাবে লক্ষ করা যায়। রাজস্থান-পাহাড়ি শৈলী, উড়িষ্যা শৈলী, মুঘল ও গুজরাটি

মিনিচেয়ার[৪] — সবগুলি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তার ফল প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা চিত্রকলার নিদর্শন। যার অন্যতম প্রমাণ বাংলার পুথির পাটাচিত্র। সেই সঙ্গে বৃহৎ বঙ্গ জুড়ে মন্দির-টেরাকোটার কথাও বলা যেতে পারে। মন্দির-টেরাকোটা যা চৈতন্য-পরবর্তী যুগেরই ফসল।[৫] পুথির পাটাচিত্রের সঙ্গে মন্দির-টেরাকোটার বিষয়বস্তুর মিল আছে। যদিও এই দুটির শিল্পকলা ভিন্ন। (দ্র. প্রণব, ১৪১৪ : ১৩৫) কিন্তু শিল্পী মনের পার্থক্য ভিন্ন নয়; কেননা তাঁরা একই সময়ের সমাজের মানুষ। তাঁদের মানসিকতা সময়কে অতিক্রম করতে পারেনি। তাঁরা মুক্তি কামনা করেছেন। 'তিন-তুলসী' দিয়ে চৈতন্যদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তাই চিত্রগুলির মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্রের মাধ্যমে লোককে বিষয়ী-সংসর্গ ত্যাগ করার শিক্ষা দেবার জন্য মহাপ্রভুর চরণে ঠাঁই দিয়েছেন।

টীকা

১. পুথির উপরিভাগে কঠিন আবরণ দিয়ে বেঁধে রাখা কাষ্ঠফলক বা অনান্য বস্তুকে কি নামকরণ করা যেতে পারে — তা বিচারসাপেক্ষ। বেশির ভাগ পুথি বিশেষজ্ঞরা 'পুথির পাটা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সুবিধার্থে 'পুথির পাটা' বা 'প্রচ্ছদ'— উভয় কথা উল্লেখ করা হল।

২. পুথির শেষে এক লিপিকর লিখেছেন, "দক্ষিণা এক আনায় পুস্তক লিখিলাম। লিখত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ পোটুয়া। লিখে ১৮ পাতায়।" অণিমা মুখোপাধ্যায় এখানে অনুমান করছেন, "এই পুঁথির পাতায় যে ছবি আঁকা রয়েছে, তা যে ঐ লিপিকরেরই (দুর্গাচরণ পটুয়া) আঁকা একথা অনুমান করলে ভুল হবার সম্ভাবনা অল্পই।" (অণিমা, ১৯৯৮ : ৬২)

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : প্রণব, ১৪১৭ : ১৩২

৪. অঞ্জন সেনের মতে, 'সাধারণত বাংলায় প্রচলিত মধ্যযুগের পুঁথির পাটা বা পুঁথিচিত্রকে তিন রকমের শৈলীতে ভাগ করা হয় : (১) রাজস্থান - পাহাড়ি শৈলী। (২) মিশ্র উড়িষ্যা শৈলী, (৩) বাংলার লোকায়ত শৈলী। এছাড়া গুজরাটি শৈলীর কয়েকটি পাটা পাওয়া গেছে মেদিনীপুরের রামগড় অঞ্চলে। মুঘল শৈলী, লখনউ অবধি বাংলায় প্রচলিত থাকলেও বাংলা পুঁথিতে তার নমুনা নেই। (অঞ্জন, ২০১০ : ১-৪)

৫. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন, তারাপদ সাঁতরা, মোহিত রায়, জুলেখা হক, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, প্রণব রায় প্রমুখ মন্দির টেরাকোটা বিশেষজ্ঞদের মত এরূপ।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অঞ্জন সেন (২০১০)। 'চিত্রিত পদ্মাপুরাণের পুঁথি'।

অণিমা মুখোপাধ্যায় (১৯৯৮)। *যখন ছাপা বই ছিল না*। বুকফ্রন্ট পাবলিকেশন ফোরাম, কলকাতা।

প্রণবকুমার সাহা (১৪১৭/২০১০)। 'বাংলা পুথির খোদিত পাটা'। লৌকিক পত্রিকা (সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা. ৪র্থ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা।

বিমানবিহারী মজুমদার (১৩৭৭/১৯৭০)। 'প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যকৃপা প্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কলকাতা।

সরসীকুমার সরস্বতী (১৯৭৮)। *পালযুগের চিত্রকলা*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আশুতোষ মিউজিয়াম (কলকাতা) ও গুরুসদয় মিউজিয়াম (কলকাতা)।